পান্তা-ইলিশ: চাপিয়ে দেওয়া প্রথা

আবার জমবে মেলা বটতলা হাটখোলা অঘ্রাণে
নবান্নের উৎসবে
সোনার বাংলা ভরে উঠবে সোনায় বিশ্ব অবাক চেয়ে রবে।

বিখ্যাত গীতিকার সুরকার ও সংগীতশিল্পী লোকমান হোসেন ফকিরের লেখা এই গানটি শুনলেই মানসপটে ভেসে উঠে পহেলা বৈশাখ। মনে পড়ে রমনার বটমূল থেকে শুরু করে গ্রামের বুড়ো পাকড় বটের ছায়ায় মেলার ছবি। এদিন মাটির সানকিতে শুকনো লংকাসমেত পান্তা ইলিশ উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। আজকাল এমন হয়েছে যে পান্তা-ইলিশ বাদ দিয়ে পহেলা বৈশাখ কল্পনাই করতে পারি না আমরা। যদিও কয়েক বছর ধরে পান্তা ও ইলিশকে এক করা অধিকাংশের কাছেই হয়ে পড়েছে আকাশ কুসুম কল্পনা। অনেকে তো ধার করে হলেও এদিন ইলিশের স্বাদ নিয়ে বাঙালি সাজতে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মান রাখতে মরিয়া হয়ে পড়েন। ইলিশের দাম এখন আকাশচুম্বী। ধনীর টেবিলে নিজেকে মানানসই হলেও নিম্নমধ্যবিত্তরা চাইলেও ইলিশ খাওয়া তো দূরের কথা ছুঁতেও পারে না। এতে অনেকেই হতাশ। অন্যদিকে পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশের আয়োজনটা হয়ে উঠেছে আজকাল যত না উৎসবের অনুষঙ্গ তার চেয়ে বেশি ধনী গরীবের বিভাজন।

আর তাই অনেকেই পান্তা-ইলিশের ঐতিহ্য

হাসান নীল

নিয়েও সন্দেহ করেন। বিজ্ঞজন ও বর্ষীয়ানদের মতে পহেলা বৈশাখের সঙ্গে পান্তা-ইলিশের সম্পর্কটা খুব বেশি দিনের না। একে চাপিয়ে দেওয়া শহুরে সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। জানা যায়, এদেশে বর্ষবরণ পালনের দুটি দিক রয়েছে। এক, আবহমান বাংলায় ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সামাজিক রীতি। অন্যটি হলো পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল রমনার বটমূল থেকে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'। তখন থেকেই রমনার বটমূলে প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হতো বর্ষবরণ। এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন নগরের উৎসবপ্রেমী নাগরিক। শিল্পীগোষ্ঠীর গানে বর্ষবরণে মেতে উঠতেন তারা। ফলে বটমূলে লোক সমাগম কম হতো না। ভিড় মানেই অস্থায়ী দোকানের আনাগোনা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রভাতী অনুষ্ঠানে অস্থায়ী কিছু দোকান বসতো বটমূল প্রাঙ্গনে। এসব স্টলের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরাই জড়িত থাকত। ১৯৮৩ সালে বটমূলের প্রভাতী অনুষ্ঠানে প্রথমবার কয়েকজন মিলে এই 'পান্তা-ইলিশ'র দোকান দিয়ে বসে। মাটির শানকিতে পান্তা খাওয়া হয়তো নাগরিকদের নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের আলপথে। আর ভাজা ইলিশের গন্ধ তাদের মোহিত করেছিল। ফলে আয়োজন লুফে নিয়েছিল সবাই। এমন চাহিদা দেখে পরের বছর আরও জমিয়ে বসে পান্তা-ইলিশের দোকান। নগরবাসীরা দল বেঁধে পান্তা-ইলিশ খাওয়া শুরু করে এদিন।

এভাবেই একটা সময় এসে বর্ষবরণের অংশ হয়ে যায় এটি। রমনার বটমূল থেকে শুরু হলেও এই রীতি শহর পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। একটা সময় দেশের বাইরের বাঙালিদের মাঝেও শুরু হয় এর প্রচলন। অনেকেই পান্তা-ইলিশকে ভাবতে থাকেন বর্ষবরণের ঐতিহ্য হিসেবে। এই ধারণা থেকেই কয়েক দশক ধরে দেশ-বিদেশে বাঙালিদের কাছে ঐতিহ্য হিসেবেই আলাদা সমাদর পাচ্ছে এই পান্তা-ইলিশ। পান্তা-ইলিশের ব্যাপারটি যতদিন স্বাভাবিক ছিল ততদিন এতে কেউ আপত্তি করেনি। কিন্তু দিন দিন অস্বাভাবিকভাবে ইলিশের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা সময় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু ততদিনে ঐতিহ্য ভেবে পান্তা-ইলিশে মজে গেছে বাঙালি। পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে এ আমাদের ঐতিহ্য। বিপত্তিটা বাধে ওখানেই। ঐতিহ্য রক্ষার্থে অনেকে সাধ্যের বাইরে গিয়ে পান্তা-ইলিশের আয়োজন করতে থাকে। এর সুযোগ নেয় ব্যবসায়ীরা। সারা বছর চড়া দামে বিক্রি করা ইলিশের দাম পহেলা বৈশাখ আসতেই দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অনেকে আবার শুরু করেন

ইলিশ কেনার প্রতিযোগিতা। এমন অসুস্থ প্রতিযোগিতা অনেকেরই বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ে। তারা মুখ খুলতে শুরু করেন এ বিষয়ে।

জানা যায়, পান্তা-ইলিশ আমাদের ঐতিহ্য না বরং চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি। ইতিহাস ঘেঁটেও মেলে না বৈশাখের সঙ্গে পান্তা ইলিশের কোনো সম্পর্ক। বাঙালির প্রথম খাদ্য ভাত। প্রাচীন বই পুস্তক থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগের একটি বই 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'। এটি প্রাকৃত ভাষার গীতি কবিতার সংকলিত গ্রন্থ। এতে গরম ঘি সহকারে ভাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ওই বইয়ে লেখা আছে 'ওগগারা ভত্তা গাইক ঘিত্তা'। অর্থাৎ, খাঁটি ঘি সহযোগে গরম ভাত। আবার নৈষধচরিতেও রয়েছে ভাতের আরও বিস্তারিত বর্ণনা। সেখানে আছে, 'পরিবেশিত অন্ন হইতে ধুম উঠিতেছে, তাহার প্রতিটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আরেকটি বিচ্ছিন্ন! সে অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু আর শুভ্রবর্ণ, সরু ও সৌরভময়।' বোঝাই যায় প্রাচীনকাল থেকেই ভাতের সাথে এদেশের মানুষের সম্পর্ক। ইলিশের সাথে নয়।

এ প্রসঙ্গে লোক গবেষক শামসুজ্জামান খান বলেন, 'বৈশাখ মূলত খরার মাস। সেসময় এ মাসে কোনো ফসল হতো না। ফলে কৃষকরা বলতে গেলে অভাব অনটনেই থাকত। সুতরাং তাদের পক্ষে ইলিশ কিনে খাওয়া সম্ভব হতো না। সুতরাং এটা মোটেও সত্যি নয় যে, কৃষকেরা নববর্ষ উদ্‌যাপনে পান্তা-ইলিশ খেয়ে বছর শুরু করতেন। গ্রামবাংলায় নববর্ষের উৎসবই ছিল খুব ছোট আকারে। কৃষাণী আগের রাতে একটি নতুন ঘটে কাঁচা আমের ডাল ভিজিয়ে রাখত, চাল ভিজিয়ে রাখত। সকালে কৃষক সেই চাল পানি খেত এবং তার শরীরে কৃষাণী পানিটা ছিটিয়ে দিত। তারপর সে হালচাষ করতে যেত। দুপুরবেলা এসে পান্তা খেতে বসত কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে। কখনও কখনও ব্যাঞ্জন হিসেবে রাখত একটু শুঁটকি, একটু বেগুন ও একটু আলু ভর্তা।

আবার ভারতবর্ষের বিভিন ধর্মীয় বইয়েও নেই এমন কোনো নির্দেশনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃহধর্মপুরান মতে রোহিত (রুই), শফর (পুঁটি), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত মাছ খাওয়া যাবে! প্রাণীজ আর উদ্ভিজ্জ তেলের বিবরণ দিতে গিয়ে জীমুতবাহন ইল্লিস (ইলিশ) এর তেলের কথা বলেছেন! এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন কোনো গ্রন্থ বা দলিল দস্তাবেজে বৈশাখ বা অন্যকোনো উৎসবে ইলিশ সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই।

বৈশাখের সঙ্গে ইলিশের এই চাপিয়ে দেওয়া সম্পর্ক কতটা অপরিকল্পিত ছিল সে আলোচনায় আসা যাক। বৈশাখ মাস ইলিশের প্রজনন কাল। এ সময় অধিকাংশ ইলিশই মা ইলিশ। পেটে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা। আর তাই এ সময় পহেলা বৈশাখ উদযাপনে পাতজুড়ে ইলিশ ভাজা শুধু অপকারীই নয় বরং ইলিশসম্পদ ধ্বংসও করে দিতে পারে। এছাড়া এই সময়কালে আইনতও ইলিশ শিকার নিষিদ্ধ। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের মৎসসম্পদ রক্ষার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইন অনুযায়ী ২৩ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চির চেয়ে ছোট ইলিশ শিকার আইনত অবৈধ। এ আকারের ইলিশকে জাটকা বলা হয়। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ইলিশ ছোট থাকে। তাই এ সময় ইলিশ শিকার তথা জাটকা নিধনের উদ্দেশ্যে নদীতে জাল ফেলা নিষেধ। ইলিশ ধরা থেকে বিরত রাখতে সরকার উপকূলবর্তী জেলেদের মাঝে খাদ্যও সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু একটি জরিপে উঠে এসেছে দেশে সবচেয়ে বেশি জাটকা নিধন করা হয় মার্চে। এ সময় ইলিশ তথা জাটকা শিকারের অন্যতম কারণ পহেলা বৈশাখ।

আমরা দেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দিন দিন দূরে সরে গেলেও আদিখ্যেতা কম দেখাই না। বিশেষ করে পহেলা বৈশাখে একদিনের জন্য বাঙালি হতে মরিয়া হয়ে ওঠাই তার প্রমাণ। আর এই বাঙালিয়ানা দেখাতে আমরা অর্বাচীনের মতো বেছে নেই চাপিয়ে দেওয়া পান্তা-ইলিশ প্রথা। বাজারে ইলিশের খোঁজে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। ফলে অসাধু মৎস ব্যবসায়ীরা এটা আঁচ করতে পেরে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন ইলিশের দাম। তা নিয়ে অবশ্য আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। ইলিশ কিনে বাঙালি সাজাটাকে বানিয়ে ফেলি প্রেস্টিজ ইস্যু। এজন্য নিষিদ্ধ জাটকা কিনে খেতেও দ্বিধা করি না। ফলে জেলেরাও অর্থলাভের আশায় নিষেধাজ্ঞা ভুলে জাল ফেলে নদীতে। বেশি অর্থপ্রাপ্তির আশায় ও আমাদের চাহিদার মেটাতে শিকার করে জাটকা। যা চলছে বছরের পর বছর ধরে। ফলে এই হটকারী পান্তা-ইলিশ প্রথার কারণে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে দেশের ইলিশ সম্পদকে। তাই একটু ভাবা প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে ভূঁইফোড় প্রথা বাঁচিয়ে রেখে কতটা ভুল করছি তা নিয়ে।